ISSN 2227-1635
বাঙলা সাহিত্যিকী ৫ম সংখ্যা, শ্রাবণ ১৪২৫

রবীন্দ্রনাথের চৈতন্যবাদী চেতনায় শ্রমজীবী মানুষ: একটি তাত্ত্বিক পর্যালোচনা

*মো. এলাম উদ্দিন

সারসংক্ষেপ: এ প্রবন্ধে 'রবীন্দ্রনাথের চৈতন্যবাদী চেতনায় শ্রমজীবী মানুষ' প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা হবে। বিত্তহীন মানুষের স্বরূপ নির্ণয়ে রবীন্দ্র চেতনার সঙ্গে প্রতীচ্যের চৈতন্যবাদীদের চেতনার সাদৃশ্য থাকলেও চৈতন্যবাদী চিন্তাধারায় মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। রবীন্দ্রনাথ নিঃসন্দেহে চৈতন্যবাদী কিন্তু তাঁর চৈতন্যবাদ বেদ, উপনিষদ ও বৈষ্ণব তত্ত্ব দ্বারা প্রভাবিত হলেও প্রাচ্য বা প্রতীচ্য চেতনার কোনো শ্রেণিভুক্ত নয়। তিনি প্রকৃতপক্ষে একটি নতুন চৈতন্যবাদের উদ্‌গাতা। রবীন্দ্রনাথের এই বিশেষ চৈতন্যবাদের বিশ্লেষণই এই প্রবন্ধে শ্রমজীবী মানুষ সম্পর্কিত প্রথম বিচারের অন্বিষ্ট। এই সমীকরণের নিরিখেই আলোচ্য প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের চৈতন্যবাদী চেতনায় শ্রমজীবী মানুষের প্রকৃতি ও স্বরূপ বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা করা হবে।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর সাহিত্য সৃষ্টিতে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের কোনো বিশেষ দার্শনিক মতবাদকে আশ্রয় করেননি বা দার্শনিকদের মতো তিনি তাঁর জগৎ ও জীবন নিজস্ব চিন্তা প্রবাহকে সুসংহত যুক্তির মাধ্যমে দার্শনিক তত্ত্বে রূপায়িত করেননি একথা সত্য এবং তিনি স্বয়ং নিজেকে দার্শনিক আখ্যায় ভূষিত করতে তাঁর সবিনয়ে আপত্তি জানিয়েছিলেন; তথাপি বিশ্বরহস্যের কেন্দ্রে তাঁর ভাবনার আভিমুখ্য, চৈতন্যের স্বরূপ উদ্‌ঘাটনে তাঁর আমৃত্যু সৃষ্টিশীল মনের ব্যাকুলতা একটি দার্শনিক ভঙ্গিকে অনিবার্যভাবে সূচিত করে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সৃষ্টিকে এমন একটি দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির অবিচ্ছিন্ন রশ্মিতে নিয়ত আলোকিত রেখেছিলেন যা তাঁর একান্তই স্বকীয় আপন জ্যোতিতে সতত সমুজ্জ্বল। দার্শনিক চিন্তার এই অনন্য মৌলিকতায় বিশেষত তাঁর মানবতাবাদী সৃষ্টি শ্রমজীবী মানুষ এক অসামান্য দীপ্তিতে ভাস্বর।[১] তাদের সুখ-দুঃখ, বিরহ মিলনপূর্ণ মানব সমাজে প্রবেশের যে আকাঙ্ক্ষা কবি-হৃদয়ে জাগ্রত ছিল তার বাস্তব ও উজ্জ্বলতম প্রতিফলন ঘটেছে শ্রমজীবী মানুষের ক্ষেত্রে। শ্রমজীবী মানুষের পারিবারিক ও সামাজিক জীবন, পারস্পরিক সম্পর্কের জটিলতা, আনন্দ-বেদনা, দুঃখ-কষ্ট, জন্ম-মৃত্যু, প্রাত্যহিক জীবন যাত্রা। মনস্তাত্ত্বিক বিশেষণ, প্রেম-অপ্রেম, অভাব-অনটন, অত্যাচার-নিপীড়ন এসব কিছুই মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত শ্রমজীবী সমাজের রূপ অত্যন্ত সজীব ও প্রাণবন্ত রূপে চিত্রিত হয়েছে তাঁর চৈতন্যবাদী চেতনায়। রবীন্দ্রনাথের চৈতন্যবাদে ব্যক্তি-চৈতন্য প্রসারের যে দিকটি আমরা পাই তা ব্যক্তি-চৈতন্য অভিব্যক্তির পথে পরিপূর্ণ বিত্তহীন মানবসমাজের দিকে অগ্রসর হয়ে চলেছে।

আধ্যাত্মিকতা তাঁর কবি-মানসের শ্রেষ্ঠতম প্রবণতা হলেও শ্রমজীবী সাধারণ মানুষের জীবন তাঁর চৈতন্যবাদী চেতনায় বিশেষ স্থান অধিকার করেছে। রবীন্দ্রনাথ শুধু আধ্যাত্মিক আতিশয্যে ভেসে গিয়ে কবিতার কায়া নির্মাণ করেন নি, তাঁর কবি-মানস গড়ে ওঠার পশ্চাতে ছিল উপনিষদের তত্ত্ব, বৈষ্ণবতত্ত্ব, বৌদ্ধ সহজিয়াতত্ত্ব ও স্বভাবসুলভ রোমান্টিকতা। একথা অনস্বীকার্য যে, রবীন্দ্রনাথের চৈতন্যবাদী চেতনাকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় এ

*সহকারী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর

চৈতন্যবাদী চেতনা বিশ্বকে আত্মস্থ করে স্বকীয়তায় অনন্য। তাই কোনো বিশেষ থিম-এ রবীন্দ্র-চৈতন্যবাদী চেতনা বাঁধা পড়েনি কখনো। এ প্রসঙ্গে শ্রী সুধীর সরকার যথার্থই বলেছেন–

> রবীন্দ্রনাথের স্বভাব বেষ্টন করেছিল কমবেশী আজীবন একটি সূক্ষ্ম আত্মকেন্দ্রিকতার গণ্ডি। তাঁর যে প্রেরণা, তাঁর যে প্রকাশ ধারা বিশেষ পথে তা একান্ত তাঁরই পাওয়ার সেখানে কারও সঙ্গে তাঁর যোগ নেই।[২]

রবীন্দ্রনাথ তাঁর মনন ও প্রজ্ঞার দ্বারা নিজ কাব্য-সৃষ্টির পথ নিজেই নির্মাণ করেছিলেন। এ পথে তাঁর পূর্বসূরী কোনো কবির বিশেষ ভাবপ্রেরণা সঞ্চার করে থাকলেও তা সামগ্রিক কবি-প্রতিভাকে আচ্ছন্ন করতে পারেনি। নিজের চৈতন্যবাদী চেতনা সম্পর্কে বলেন–

> আমি ভালবেসেছি এই জগৎকে, আমি প্রণাম করেছি মহৎকে, আমি কামনা করেছি মুক্তিকে পরম পুরুষের কাছে আত্মনিবেদনে, আমি বিশ্বাস করেছি মানুষের সত্য মহামানবের মধ্যে যিনি মানুষের সন্নিবিষ্ট। আমি এসেছি এই ধরণী মহাতীর্থে। এখানে সর্বদেশ, সর্বজাতি ও সর্বকালের ইতিহাসের মহাকেন্দ্রে আছেন নরদেবতা, তাঁরই বেদীমূলে নিভৃতে বসে আমার অহংকার, ভেদবুদ্ধি পালন করবার দুঃসাধ্য চেষ্টায় আজও প্রবৃত্ত আছি।[৩]

রবীন্দ্রনাথ তাঁর সমস্ত জীবনের শিল্প-ভবনার মধ্যদিয়ে জীবনের এই চরমতম অর্থকেই ব্যঞ্জিত করে তুলেছেন। মানুষ তথা বৃহত্তর মানব-জীবন কবির কাছে বিরাট সাধনা ও অসীম অনুধ্যানের বিষয়বস্তু। সীমার মধ্যে অসীমের প্রকাশকে তিনি বলেছেন–'আমি আছি', কারণ সৃষ্টি হচ্ছে প্রকাশ, আর সেই প্রকাশ অসীমের প্রকাশ। তাঁর ভাষায়–

> অসীম যেখানে আপনাকে সীমায় সংহত করেছেন সেখানে অহংকার। অহমস্মি। সেখানেই তিনি হচ্ছেন আমি আছি। অসীমের বাণী অর্থাৎ সীমার মধ্যে অসীমের প্রকাশই হচ্ছে অহমস্মি। আমি আছি। যেখানেই হওয়ার পালা সেখানেই আমির পালা। সমস্ত সীমার মধ্যেই অসীম বলেছেন অহমস্মি আমি আছি এটিই হচ্ছে সৃষ্টির ভাষা।[৪]

মানুষের মধ্যে তিনি মহান স্রষ্টার আবির্ভাব ও অবস্থান দেখে বিস্ময়াভিভূত হয়ে মানুষকে নবরূপী নারায়ণরূপে শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করেছেন। রবীন্দ্রনাথের চেতনায় মানুষ কোন বিশেষ সংস্কার দ্বারা খণ্ডিত হয়ে ধরা দেয়নি। তাঁর নিকট মানুষ এক অখণ্ড জীবনসত্তা। স্থান-কাল-পাত্রের সীমিত গণ্ডি অতিক্রম করে যে বৃহত্তর জীবন সত্তা পৃথিবীর চির অগ্রসরমান সভ্যতাকে গতিদান করছে সেই বৃহত্তর শ্রমজীবী সমাজের কথা তিনি ভেবেছেন। এ সম্পর্কে শ্রীমন্ত কুমার জানা বলেন–

> যে মর্ত্যগৃহে কবির জন্ম, সেখানে প্রাণের খেলা শত ধারায় তরঙ্গিত, তাঁকে ঘৃণা করে ঊর্ধ্বলোকে স্বর্গ সন্ধানের চেষ্টা কবি করেননি। কবির গভীর বিশ্বাস ছিল যে, দুর্লভ মানবজন্ম প্রাপ্তি একটি সৌভাগ্যের ব্যাপার, যুগ-যুগান্তরের পূণ্যে একে লাভ করা যায়। সুখ-দুঃখ মিলন-বিরহের সে বিচিত্র জীবনযাত্রা সেগুলোই পৃথিবীকে স্বর্ণ খণ্ড করে রেখেছে।[৫]

রবীন্দ্রনাথের চৈতন্যবাদী চেতনায় মানুষ আত্মকেন্দ্রিক ব্যক্তিস্বার্থের বৃত্তে আবদ্ধ মানুষ নয়। যারা কায়িক পরিশ্রম দ্বারা দেশ ও জাতির সুস্বাস্থ্য বজায় রাখার কাজে সদ্য ব্যস্ত সেই শ্রমিক

মানুষ– যেমন পুরাতন ভৃত্য, কেষ্টা, উপেক্ষা করে রবীন্দ্রনাথের মানুষ। রবীন্দ্রনাথের মানুষ অনাগরিক। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন–

> এই আহ্বান মানুষকে কোনো কালে কোথাও থাকতে দিলে না, তাকে চিরপথিক করে রেখে দিল। ক্লান্ত হয়ে যারা পথ ছেড়ে পাকা করে ঘর বেঁধেছে, তাঁরা আপন সমাধি ঘর রচনা করেছে। মানুষ যথার্থই অনাগরিক। জন্তুরা পেয়েছে বাসা, মানুষ পেয়েছে পথ।[৬]

যে মানুষের ঘামের বিনিময়ে সভ্যতার আকাশচুম্বী অট্টালিকায় ওঠে, যার লাঙলের ফলায় ওঠে সোনার মাটি, কলের চাকা ঘোরে অবিরত সেই খেটে-খাওয়া মানুষই কবি-মানসকে আচ্ছন্ন করেছিল সবচেয়ে বেশি। এ প্রসঙ্গে প্রমথনাথ বিশী বলেন–

> সমাজের যে কোন স্তরের মানুষ যেমন করেই জীবিকা অর্জন করুক না কেন, হোক না সে চাষা, হোক না সে কুলি-মজুর, হোক না সে হরিপদ কেরানী, সে কবির সত্য সহজ সহানুভূতিটুকু থেকে বঞ্চিত হয়নি।[৭]

রবীন্দ্রনাথের চৈতন্যবাদী চেতনার পরিমণ্ডল অনেকটাই তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাসঞ্জাত। তিনি জমিদারি তদারকি উপলক্ষ্যে গ্রাম-বাংলার বিশেষ করে সিরাজগঞ্জ জেলার শাহজাদপুর, নওগাঁ জেলার পতিসর, কুষ্টিয়া জেলার শিলাইদহ ইত্যাদি এলাকার গ্রাম্য প্রকৃতি ও গ্রাম্য জনগণের মাঝে ঘুরে ফিরে পদ্মার দুই তীরের বৃহত্তর খেটে খাওয়া শ্রমজীবী মানুষের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রা, তাদের সুখ-দুঃখ, বিরহ-বেদনাকে সহানুভূতির দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করেছেন এবং এই অভিজ্ঞতা তাঁর শিল্প সৃষ্টির ক্ষেত্রে তাঁকে বিশেষভাবে প্রেরণা যুগিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে কবি বলেন–

চাষী ক্ষেতে চালাইছে হাল,
তাঁতি বসে তাঁত বোনে; জেলে ফেলে জাল
বহুদূর প্রসারিত এদের কর্মভার
তারি পায়ে ভরদিয়ে চলিতেছে সমস্ত সংসার।[৮]

কবি এর আগে কলকাতার গণ্ডিবদ্ধ নাগরিক জীবনের মাঝে দেখেছেন যে প্রত্যেক মানুষই খণ্ডিত, অর্থাৎ সেই জনমণ্ডলীর সঙ্গে আবহমান বাংলার পরিপূর্ণ ভাবসাধনার কোনো প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল না। স্বভাবগত কারণেই রবীন্দ্রনাথ কলকাতার গণ্ডিবদ্ধ জীবন থেকে বেরিয়ে বাংলাদেশে বিভিন্ন পল্লী অঞ্চল ঘুরে কাঙ্ক্ষিত সেই পরিবেশ ও পরিমণ্ডল অর্জন করেন এবং পরিপূর্ণ জীবনের আস্বাদ লাভে ধন্য হন। এ প্রসঙ্গে কবি রবীন্দ্রনাথ বলেন–

> মানুষের পরিচয় খুব কাছে এসে আমার মনকে জাগিয়ে রেখেছিল। তাদের জন্য চিন্তা করেছি, কাজ করেছি কর্তব্যের নানা সংকল্প বেঁধে তুলেছি, সেই সংকল্পের সূত্র আজও বিচ্ছিন্ন হয়নি আমার চিন্তায়। সেই মানুষের সংস্পর্শে সাহিত্যের পথ এবং কর্মের পাশাপাশি হতে আরম্ভ হলো আমার জীবনে।[৯]

রবীন্দ্রনাথ খেটে-খাওয়া শ্রমজীবী মানুষের বিচিত্র অনুভূতিকে প্রত্যক্ষ করে তাদের হাসি-কান্নার সঙ্গে একাত্ম সেই আলোকে তাঁর কাব্যের বিপুল ভাণ্ডার গড়ে তুলেছিলেন। কবির চোখে বৃহত্তর শ্রমজীবী সমাজ এক বিশেষ মহিমা ও অভিব্যক্তি নিয়ে দেখা দিয়েছিল। সভ্যতার চাকচিক্যের মূলে এইসব শ্রমজীবী মানুষ এবং তাদের নিরলস কর্তব্য পালন যে সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে তা দেখে অভিভূত হয়ে পড়েন তিনি। তাই কবি শ্রমজীবী

মানুষকে কখনো ছোট করে ভাবতে পারেননি। জমিদারি পরিদর্শন করার সময় জনজীবন কবির চেতনায় গভীরভাবে রেখাপাত করেছিল। কবি অবলোকন করেন পদ্মার দুই তীরের কর্মরত হাজারো শ্রমজীবী মানুষকে। যাদের শ্রম সভ্যতার নব নব সম্ভাবনাকে ফলপ্রসূ করে তুলেছিল। অথচ জীবন ধারণের ন্যূনতম অধিকার থেকে তারা বঞ্চিত নির্মমভাবে। এসব দারিদ্র্য-পীড়িত মানুষের মুখচ্ছবি কবিকে অত্যধিক ব্যথিত ও মর্মাহত করে তুলেছিল। এসব শ্রমজীবী সাধারণ মানুষ কবির হৃদয়ে শুধু আলোড়ন সৃষ্টি করেনি; তাদের জীবন ও জীবিকার প্রতি কবিকে শ্রদ্ধাশীল করে তুলেছিল। তাই এই প্রসঙ্গে বিভিন্ন সময় রবীন্দ্রনাথ তাঁর কবিতায় ও ব্যক্তিগত চিঠিপত্রে যে শ্রদ্ধাপূর্ণ বাণী উচ্চারণ করেছিলেন তা শ্রমজীবী সাধারণ মানুষ ও তাদের মনুষ্যত্বকে সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করেছিল। নিজে জমিদার হওয়া সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্বগোত্রীয়দের প্রতি পক্ষপাতিত্ব না করে সত্য কথা উচ্চারণ করে গেছেন, ব্যক্তিগত লাভ-ক্ষতির কোনো তোয়াক্কা করেননি। কৃষক ও জমিদারের মধ্যকার যে পর্বত-সমান বৈষম্য তার স্বরূপ উদঘাটনপূর্বক কৃষকদেরকেই জমির আসল মালিক বলে নিঃসঙ্কোচে রায় দিয়ে গেছেন। এ প্রসঙ্গে কবি বলেন–

> আমার ব্যক্তিগত পেশা জমিদারী কিন্তু আমার স্বভাবগত পেশা আসমানদারী। এইজন্য জমিদারীর জমি আঁকড়ে থাকতে আমার অন্তরে প্রবৃত্তি নেই। এই জিনিসটার পরে আমার শ্রদ্ধার একান্ত অভাব। আমি জানি, জমিদার জমির জোঁক, সে প্যারাসাইট, পরশ্রমজীবী। আমরা পরিশ্রম না করে, উপার্জন না করে যথার্থ দায়িত্ব গ্রহণ না করে ঐশ্বর্য ভোগের দ্বারা দেহকে অপটু ও চিত্তকে অলস করে তুলি। যারা বীর্যের দ্বারা বিলাসের অধিকার লাভ করে আমরা সে জাতের মানুষ নই। প্রজারা আমদের অন্ন জোগায় আর আমলারা আমাদের মুখে অন্ন তুলে দেয়, এর মধ্যে পৌরুষত্ব নেই, গৌরবও নেই।[১০]

কবি হৃদয় ও মননে সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ অসাধারণরূপে দেখা দিয়েছিল। তিনি শ্রমজীবী সাধারণ মানুষের জীবন ও জীবিকাকে এমন দৃষ্টিতে অবলোকন করতেন যে, শ্রমজীবী সাধারণ ঘর্মাক্ত মানুষের মাঝে তিনি স্রষ্টাকে পর্যন্ত প্রত্যক্ষ করেছেন। এ প্রসঙ্গে সুধীর কুমার নন্দী বলেন–

> মানুষের কর্ম তার বন্ধন নয়। কর্মের মধ্য দিয়ে বন্ধন মুক্তি ঘটে; চিত্তের জড়তা বিনষ্ট হয়। অনলস মননে সত্যের প্রতিষ্ঠা, ক্লান্তিহীন কর্মসাধনায় ব্যক্তিত্বের স্ফূরণ। জগতে সকল কর্মেই ঈশ্বরের আশীর্বাদ রয়েছে। কাজের মধ্যেই সেই পরম পুরুষের সাক্ষাৎ মেলে। আজীবন কবি এ মতে বিশ্বাসী ছিলেন।[১১]

সাধারণ খেটে খাওয়া চাষা-ভূষা সাধারণ মানুষ বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে রবীন্দ্রনাথের চৈতন্যবাদী চেতনায় ধরা দিয়েছে। অনেকেই বলে থাকেন সাধারণ মানুষের সঙ্গে খোলামেলাভাবে কবি কখনো মিশতে পারেননি, একথা আংশিক সত্য বটে, একে পরিপূর্ণ সত্য হিসেবে গ্রহণ করা যায় না। কবি তাঁর কবিতায় এ প্রসঙ্গে বলেছেন–

তিনি গেছেন যেথায় মাটি ভেঙ্গে করছে চাষা চাষ
পাথর ভেঙ্গে কাটছে যেথায় পথ,
খাটচে বারো মাস।
রৌদ্র জলে আছেন সবার সাথে,
ধূলা তাঁহার লেগেছে দুইহাতে'

তারি মতন শুচি বসন ছাড়ি
আয়রে ধূলার পরে।[১২]

রবীন্দ্রনাথ শুধু বিশ্ববরেণ্য কবি ও প্রাচ্যের ঋষিই ছিলেন না, তিনি ছিলেন জমিদার। তাই সাধারণ মানুষ তাঁর কাছে এসে স্বতঃস্ফূর্ত তাদের অভিযোগ বা ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখের কথা বলতে যে নারাজ হবে তা স্বাভাবিক ছিল, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমধর্মী দৃশ্য লক্ষ্য করা যায় তাঁর অকুণ্ঠ আন্তরিকতা ও স্নেহপ্রবণ শান্তসৌম্য মূর্তি দেখে। কোনো প্রজা সাধারণ ভীতি বা দ্বিধান্বিত হতে, প্রতিটি মানুষের সুখ-দুঃখের কথা তাঁর হৃদয় নিঃসৃত সহানুভূতি লাভে ধন্য হয়েছিল। প্রজারা তাদের একজন করে অনেকাংশেই অনুভব করেছে। আবার অনেক সময় তাদের নিতান্ত কৃপার পাত্র হিসেবে ভাবতেও এতটুকু দ্বিধা করেননি। এ প্রসঙ্গে শচীন্দ্রনাথের একটি উক্তির উদ্বৃতি দেয়া যায়–

> সকল শ্রেণির প্রজাদের সঙ্গে তিনি অসংকোচে মিশতেন, তাদের সঙ্গে আলাপ করতেন, তাদের অভাব-অভিযোগের কথা শুনতেন তার প্রতিকার করতেন। প্রজারা দেবতার মতো তাঁকে ভক্তি করত। তাই তো দেখি বুড়ো ডাকাতের সর্দার পাশের জমিদারের পাঁচশো প্রজাকে ধরে নিয়ে এসে বলেন, নিয়ে এলুম এদের আমাদের একবার দেখে যাক। এমন চাঁদ মুখ তোর দেখেছিস। তাই পাল্কী থামিয়ে পায়ের কাছে একটা টাকা নজরানা রেখে প্রজা বলে দেব না, না দিলে তোরা খাবি কি?[১৩]

সাধারণ মানুষের জীবন ও জীবিকা কবি-মনকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিল। তাই সাধারণ মানুষের শ্রমের বিনিময়ে অর্জিত নির্মল রুজি ও তাদের সহজ সরল অভিব্যক্তি কবিকে ধূলি-মলিন পৃথিবীর মাঝে যেন স্বর্গের অনুভব এনে দিয়েছিল। তাই কবি সাধারণ মানুষের সঙ্গে এক হবার জন্য আকুতি-মিনতি করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাই তাঁর পারিবারিকও সামাজিক সংস্কারের বেড়া ভেঙে বহুবার সাধারণ শ্রমজীবী মানুষের সঙ্গে একাত্ম হবার চেষ্টা করেছিলেন। বাস্তবিক সম্ভব না হলেও অনেকাংশেই মানসিকভাবে এ মিলন সাধনা ফলবতী হয়েছিল। তাই কবি প্রাণের দরদভরা স্বীকারোক্তি এভাবে কবিতায় উচ্চারিত হয়েছিল–

সে তারিতে বাঁধিলাম তার
গাহিলাম আরবার,
মোর নাম এই বলে খ্যাত হোক
আমি তোমাদেরি লোক,
আর কিছু নয়
এই হোক শেষ পরচয়।[১৪]

খেটে খাওয়া মানুষের সারল্য সত্যনিষ্ঠ, স্নেপ্রবণতা, মহানুভবতা, শ্রদ্ধাশীলতা ও কর্তব্য পরায়ণতা ইত্যাদি মানবিক গুণাবলি কবি মনকে বিশেষভাবে দোলা দিয়েছিল এবং তাদের প্রতি তাঁকে অনেকাংশেই স্নেহকাতর করে তুলেছিল। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পরিবেশে ও উপলক্ষ্যে দেখা এ সকল গুণাবলী কবি চিত্তে গভীরভাবে রেখাপাত করেছিল এবং কবি এগুলোকে তার স্মৃতির মণিকোঠায় সযত্নে লালন করেছিলেন। পরবর্তী সময়ে এই স্মৃতি-সঞ্চিত অভিজ্ঞতাকে বিশেষ বিশেষ মুহূর্তে কখনো কথায় কখনো কবিতায় ব্যক্ত করেছেন। এইরূপ একটি ঘটনা সম্পর্কে কবিকে স্মৃতিচারণ করে বলতে শুনি–

> মনে আছে সাহজাদপুরে থাকতে সেখানকার খানসামা একদিন সকালে দেরী করে আসাতে আমি রাগ করেছিলুম; সে এসে তাঁর নিত্য নিয়মিত সেলামটি করে ঈষৎ অবরুদ্ধ কণ্ঠে বললে, কালরাত্রে আমার আট বছরের মেয়েটি মারা গেছে। এই বলে ঝাড়নটি কাঁধে করে আমার বিছানাপত্র ঝাড় গোছ করতে গেল।[১৫]

কবি মনের এ বেদনা-বিক্ষুব্ধ অভিব্যক্তিই একদিন 'কর্ম' কবিতারূপে আত্মপ্রকাশ করে শাহজাদপুরের সেই খেটে-খাওয়া খানসামার দুঃখের সঙ্গে একাত্ম হয়ে বেদনার নির্ঝরণী বইয়ে দিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিজস্ব চেতনার আলোকে বৃহত্তর শ্রমজীবী মানব সমাজকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তিনি কাব্য রচনা করতে গিয়ে শুধু ভাবলোকের উত্তুঙ্গ শিখরে আরোহন করে নিচে অবস্থানরত খেটে-খাওয়া জনমণ্ডলীর দিকে দৃষ্টিপাতপূর্বক কুম্ভীরাশ্রু বিসর্জন করেননি। পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক কবি হওয়া সত্ত্বেও শুধু প্রাণের দুর্বার টানেই তিনি বারবার মাটির বুকে বিচরণশীল মানুষের কাছাকাছি এসেছেন। শুধু কাব্য সৃষ্টির ক্ষেত্রেই নয় ব্যক্তিগত জীবনে রবীন্দ্রনাথ প্রত্যক্ষভাবেই সাধারণ খেটে-খাওয়া মানুষকে দুঃখ দৈন্যের হাত হতে মুক্তি দেবার প্রত্যাশায় কৃষির উন্নতি সাধনসহ শিক্ষা ও সমবায় পদ্ধতির প্রবর্তন করেন। এ প্রসঙ্গে সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেন–

> ১৯৩০ সালের ২৮ শে সেপ্টেম্বর তারিখে লেখা একটি চিঠিতে সমবায় নীতি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ লেখেন যে, চাষীকে আত্মশক্তিতে দৃঢ় করে তুলতে হবে, এই ছিল আমার অভিপ্রায়, এ সম্বন্ধে দুটো কথা সর্বদাই আমার মনে আন্দোলিত হয়েছে, জমির সত্ত্ব ন্যায়ত জমিদারের নয়, চাষীর।
>
> দ্বিতীয়ত: সমবায় নীতি অনুসারে চাষের ক্ষেত্রে একত্র করে চাষ না করতে পারলে কৃষির উন্নতি হতেই পারে না। মান্ধাতার আমলের হাল লাঙ্গল নিয়ে আল বাঁধা টুকরো জমিতে ফসল ফলানো তার ফুটো কলসীতে জল আনা একই কথা।[১৬]

অনেকেই বলেন জমিদার হিসেবে জমিদারির সঙ্গে সম্পৃক্ত গ্রামের কৃষকদের উন্নতির জন্যই তিনি শুধু চেষ্টা করে গেছেন; নগরকেন্দ্রিক কল-কারখানার শ্রমিক, মুটে, মজুরদের সম্পর্কে কিছুই বলেননি এবং তাদের ভাগ্য উন্নয়নের জন্য কিছুই করেননি। একথা যথার্থ নয়। মাঠের কৃষক, নদীর মাঝি, কল-কারখানার শ্রমিকদের জন্য তাঁর দরদভরা হৃদয়ের আর্তি কম উৎসারিত হয়নি। এ প্রসঙ্গে ক্ষুদিরাম দাস বলেন–

> রাষ্ট্র বলতে রবীন্দ্রনাথ প্রকৃষ্ট সমাজ বন্ধনের স্বরূপকেই বুঝেছেন এবং তাকে গ্রামকেন্দ্রিক করতে চেয়েছিলেন এই অর্থে যে গ্রামীণ মানুষের সংখ্যা এখনকার ভারতে শতকরা নব্বই এবং জীবিকা হিসেবে কৃষি এবং কৃষকেরই প্রাধান্য। দেখতে হবে তখন কল-কারখানা এবং শ্রমিকের জীবন সমস্যা উলেখযোগ্য মূর্তি নিয়ে দেখা দেয়নি। পরে যখন তা হয়েছে তখন সর্বাগ্রে রবীন্দ্রনাথই তার স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করেছেন।[১৭]

কবি গুরু যতই কাব্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে অন্তিম পর্বের দিকে অগ্রসর হতে থাকেন ততই তাঁর মাঝে পূর্বেই সেই সাধারণ জীবন-প্রীতি আরো ঘনীভূত হতে থাকে। যারা শুধু অকাতরে দান করে চলে যুগের পর যুগ; শতাব্দীর পর শতাব্দী। কিন্তু বিনিময়ে কিছুই গ্রহণ করতে পারে না এবং গ্রহণ করবার সামান্যতম অধিকার থেকেও যারা নির্মমভাবে বঞ্চিত তাদের সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেন–

ওরা কাজ করে
দেশে দেশান্তরে,
অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গের সমুদ্র নদীর ঘাটে ঘাটে
পাঞ্জাবে, বোম্বাই, গুজরাটে।
গুরু গুরু গর্জন, গুন গুন স্বর
দিনরাত্রে গাঁথাপাড় দিন যাত্রা করিছে মুখর।
দুঃখ-সুখ দিবস রজনী
মন্দ্রিত করিয়া তোলে জীবনের মহামন্ত্রধ্বনি।
শত শত সাম্রাজ্যের ভগ্নশেষ পরে
ওরা কাজ করে।[১৮]

কবি পৃথিবীব্যাপী শ্রমজীবী মেহেনতি জনতার উপর অন্যায় ও অত্যাচারের বীভৎস দৃশ্য অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করেছিলেন। তিনি সুস্পষ্টভাবে অনুধাবন করেন যে, মেহেনতি মানুষের রক্ত শোষণ করে একদল লোক তাদের স্বার্থকে চরিতার্থ করে চলেছে। স্রষ্টার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হিসেবে প্রতিটি মানুষের যে একটা স্বাধীন সত্তা আছে এবং পৃথিবীর জলবায়ুর মতো প্রতিটি সম্পদেই যে তাদের তুল্য অধিকার রয়েছে একথা বুঝেও তারা না বুঝার ভান করে। এই শ্রেণির সুবিধাবাদীদের মুখোশ রবীন্দ্রনাথ খুব নিখুঁতভাবেই উন্মোচন করেছেন এবং তাদের মনুষ্যত্বহীন আচার আচরণ সম্পর্কে তীব্র বিদ্রুপবাণ নিক্ষেপ করে বলেছেন–

> ধনের বৈষম্য যখন সমাজে পার্থক্য ঘটায় তখন ধনীর দল সেই পার্থক্যকে সমূলে ঘুমাইতে ইচ্ছা করে না, অথচ সেই পার্থক্যটা যখন বিপদজ্জনক হইয়া ওঠে তখন বিপদটাকে কোনো মতে ঠেক দিয়ে ঠেকাইয়া রাখিতে চায়। শ্রমজীবী দল যতই গুমরিয়া গুমরিয়া উঠিতেছে ততই তাহাদিগকে ক্ষুধার অন্ন না দিয়া ঘুম পড়াইবার গান গাওয়া হইতেছে; তাহাদিগকে অল্প স্বল্প এটা ওটা দিয়া কোনো মতে ভুলাইয়া রাখিবার চেষ্টা।[১৯]

শ্রমজীবী মানুষের জীবনের সীমাহীন দুঃখ-দৈন্য কবিকে যেমন দুঃখ ভারাক্রান্ত করে তুলতো তদ্রুপ তাদের সারল্য ও স্বতঃস্ফূর্ত আন্তরিকতা বিশেষভাবে তাকে মুগ্ধ করতো। তাই শ্রমজীবী মানুষকে কবি যে শ্রদ্ধা জানিয়ে গেছেন সেই বক্তব্য স্মরণ করে, আলোচনা শেষ করছি। তা হলো–

> এই ধূলো মাটি ঘাসের মধ্যে আমি হৃদয় ঢেলে দিয়ে গেলাম, বনস্পতি ঔষধের মধ্যে। যারা মাটির কোলের কাছে আছে, যারা মাটির হাতে মানুষ, যারা মাটিতে হাঁটিতে হাঁটিতে মাটিতেই বিশ্রাম করে, আমি তাদের সকলের বন্ধু; আমি কবি।[২০]

রবীন্দ্রনাথ যে নতুন চৈতন্যবাদের উদ্ভাবক তাই নয়, শ্রমজীবী মানুষের চিন্তাধারার ক্ষেত্রেও তাঁর অনন্যতা অনস্বীকার্য। তাঁর শ্রমজীবী মানুষ তাঁর বিশিষ্ট চৈতন্যবাদের ভিত্তির উপরই প্রতিষ্ঠিত। আর তাঁর চৈতন্যবাদের স্বাভাবিক উত্তরণ ঘটেছে তাঁর মানবতাবাদে। সর্বাঙ্গীনভাবে মনুষ্যত্বের অখণ্ডতা নিয়ে তিনি বেঁচে থাকার মহান সন্ধানটি করেছিলেন।

তথ্যসূচি:

---

১ শ্রী হীরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, *বিশ্ব জিজ্ঞাসা*, (রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৩৮০) পৃ. ২১৯

২ সুধীরচন্দ্র কর, *রবীন্দ্র আলোকে রবীন্দ্র-পরিচয়* (কলিকাতা, ১৩৬০) পৃ. ১০

৩ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'আত্মপরিচয়',*রবীন্দ্র রচনাবলী*, দশম খণ্ড, (কলিকাতা, বিশ্বভারতী, ১৯৬১), পৃ.

৪ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'আমার জগৎ' *রবীন্দ্র রচনাবলী*, দ্বাদশ খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৬৪

৫ শ্রীমন্তকুমার জানা, *রবীন্দ্রনাথ*, (কলিকাতা, ১৩৭৬) পৃ. ১৭৪

৬ 'মানুষের ধর্ম', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, দ্বাদশ খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৯৯

৭ শ্রী প্রমথনাথ বিশী, *রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প*, (কলিকাতা, ১৯৬৭), পৃ. ৭৮

৮ 'জন্মদিনে' কবিতা সংখ্যা-১০, *রবীন্দ্র রচনাবলী*, দশমখণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪১

৯ উদ্ধৃত, প্রশান্ত কুমার দাশগুপ্ত, 'দেনা-পাওনা: বিষামৃতের ফসল',সম্পাদনা সুখেন ভট্টাচার্য, *আন্তর্জাতিক ছোটগল্প ও সামাজ-জিজ্ঞাসা*, (প্রতিভাস, কলিকাতা, ১৯৯০) পৃ. ৬২

১০ প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়, *রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্র সাহিত্য প্রবেশক*, প্রথম খণ্ড, (কলিকাতা, বিশ্বভারতী, অগ্রহায়ণ, ১৪০১) পৃ. ২২

১১ সুধীর কুমার নন্দী, *রবীন্দ্র দর্শন*, (কলিকাতা, অন্বীক্ষণ, ১৯৬২) পৃ. ৮১

১২ 'গীতাঞ্জলি', কবিতা সংখ্যা-১১১, *রবীন্দ্র রচনাবলী*, তৃতীয় খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৭

১৩ শচীন্দ্রনাথ অধিকারী, 'সহজ মানুষ', *রবীন্দ্রনাথ*, (কলিকাতা, ১৯৬৮) পৃ. ২০

১৪ "সেঁজুতি" 'পরিচয়' *রবীন্দ্র রচনাবলী*, দশম খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ২০৩

১৫ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'ছিন্ন পত্রাবলী', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, ষোড়শ খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৮৭

১৬ সোমেন্দ্রনাথ ঠাকুর, *রবীন্দ্রনাথ, নজরুল ও বাংলাদেশ*, (কলিকাতা, ১৯৭২) পৃ. ৮

১৭ ক্ষুদিরাম দাশ, *প্রগতি পরিচায়ক রবীন্দ্রনাথ*, (কলিকাতা, ১৯৭২) পৃ. ১৬

১৮ 'আরোগ্য' কবিতা সংখ্যা-১০, *রবীন্দ্র রচনাবলী*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪১

১৯ 'আত্মপরিচয়' *রবীন্দ্র রচনাবলী*, দশম খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ২২৮

২০ প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়, *রবীন্দ্র জীবনী ও সাহিত্য প্রবেশক*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬৭।